ক্যানসার ওয়ার্ড – একটি পাঠ
শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

আলেকজান্ডার সোলঝোনিৎসিনের জন্ম হয় ১৯১৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর। তাঁর ক্যানসার ওয়ার্ড উপন্যাসের নায়ক ওলেগ কস্টোগ্লটভ বলেছিল ১৯২০ সালে তার জন্ম। সমসাময়িক এই দুজনের প্রথম জীবনের ইতিহাস এত একরকম যে একজনের কথাতেই দুজনের বিবরণ হয়ে যায়। আমি লেখকের কাহিনী দিয়ে এই নিবন্ধ শুরু করছি। পাঠক ধরে নিতে পারেন সেটা নায়কের কাহিনীও বটে।

উপক্রমণিকা

সোলঝেনিৎসিনের বাবা ছিলেন ইম্পিরিয়াল রাশিয়ান আর্মির একজন অফিসার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মস্কোয় পড়তে আসা একটি ইউক্রেনী মেয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁরা বিবাহ করেন কিছুকাল পরে সন্তানসম্ভবা মেয়েটির কাছে খবর আসে তার স্বামী নিহত হয়েছেন। জন্মের আগেই সোলঝেনিৎসিন পিতৃহীন হয়ে গেলেন। তাঁর মা আর বিয়ে করেন নি। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় প্রবল টালমাটালের মধ্যেও কোনরকম বিতর্কে না জড়িয়ে পরম ধৈর্যে ছেলেটিকে মানুষ করে তুলেছিলেন। ছাত্র হিসাবে সোলঝেনিৎসিন ছিলেন মেধাবী। গণিত ও বিজ্ঞানে ডিগ্রি পেলেন। তদুপরি করেসপন্ডেন্স কোর্সে নিলেন সাহিত্য ও ইতিহাসের পাঠ। ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে গ্রন্থকার হবেন। এখন সদ্য প্রবেশ করেছেন কর্ম ও সংসারজগতে।

এই সময় বাঁধল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। না চাইলেও কন্‌স্ক্রিপশনের নিয়মে যুদ্ধে তাঁকে যেতেই হত। তিনি নিজের ইচ্ছাতেই গেলেন। নিজগুণে উন্নতিও করলেন সেখানে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপর সদয় ও আস্থাশীল। কোথাও কোনো বিপদসংকেত ছিল না। এই সময় হঠাৎ একদিন ঘটল বিনামেঘে বজ্রপাত। বড়কর্তার ঘরে ডাক পড়ল তাঁর । তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে, দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। সেকালের (১৯৪৫) সোভিয়েট রাশিয়ার সবচেয়ে বড় অপরাধ এইটি। তার জন্য প্রাপ্য ছিল কঠিনতম শাস্তি। তড়িঘড়ি বিচার হয়ে গেল। এতদিনের কৃতিত্বের সমস্ত অভিজ্ঞান কেড়ে নেওয়া হল তাঁর কাছ থেকে। পত্নীকে ডিভোর্স দিতে হল (দেশদ্রোহীর পত্নী কোন চাকরি পাবেনা, এইই নিয়ম)। প্রথমে কারাবাস। তারপর লেবার ক্যাম্পের শ্রমিক জীবন। তারপর রাশিয়ারই কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে চিরনির্বাসন। সবমিলিয়ে চোদ্দ পনের বছর কেটে গেল। মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই একজন তরতাজা যুবকের জীবন থেকে মুছে গেল তার শিক্ষা, কর্ম, সংসার, পেশা, তার গ্রন্থকার হবার স্বপ্ন, সব কিছু।

দেশদ্রোহিতাটা কিরকম ছিল? এইরকম– যে তিনি প্রবাসে সৈন্যশিবিরে বসে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের যে সব চিঠিপত্র লিখতেন তার মধ্যে একজনের সঙ্গে স্টালিনকে নিয়ে কিছু রংতামাশা ছিল। স্টালিনের গোঁফ নিয়ে, গা জোয়ারি ভাবভঙ্গি নিয়ে তিনি বড়দাদা বলে ঠাট্টা করেছিলেন। যুদ্ধবন্দিদের বিষয়ে রুশ নীতি তার ভালো লাগে নি। রুশ জার্মান সীমান্তে রাশিয়ান সৈনিকরা জার্মান নাগরিকদের ওপর অত্যাচার করে তা তাঁর ভালো লাগে নি। রুশ সৈনিকরা যুদ্ধের সুযোগে এই অসহায় গরিব জার্মানদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। মেয়েদের ধর্ষণ করছে, হত্যা করছে, স্বচক্ষে এইসব দেখে তিনি বলেছিলেন শত্রু না হয় খারাপ, কিন্তু আমরাই বা কম কিসে?

ভেবেছিলেন মাত্র, কাজে কিছু করেন নি। ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছিলেন মাত্র, প্রচারপুস্তিকা নয়। তা ও খুলে পড়া হয়েছে। নিশ্চয়ই কারো না কারো সন্দেহের তালিকায় ছিলেন তিনি। কিসের সন্দেহ? না, এই লোকটা রোবটের মত নয়। নিজে নিজে ভাবতে পারে। অর স্বৈরাচারীর কাছে এই ভাবতে পারাটাই বিপজ্জনক, অতএব তাকে চিহ্নিত করো। এবং অঙ্কুরেই বিনাশ করো।

সৈনিকবৃত্তি থেকে বরখাস্ত করে সোলঝেনিৎসিনকে তুলে দেওয়া হল গোয়েন্দা পুলিশের হাতে। জঘন্যতম অপরাধীর স্বীকারোক্তি আদায়ের কিছুই ছিল না। সোলঝেনিৎসিন তো গোড়া থেকেই স্বীকার করেছিলেন, হাঁ এই চিঠি তাঁর লেখা। তবু।

মহাযুদ্ধ শেষ হল কয়েকমাস পরে। তখন তিনি, এবং তাঁর মতো আরও অনেক লোক, মস্কোর কারাগারে বন্দি। মিত্রপক্ষের জয় হয়েছে। অ্যামনেস্টির হিড়িকে অনেক চোর ডাকাত ছাড়া পেয়ে গেল। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দিদের কথা আলাদা। কারাগারের ঘুলঘুলি দিয়ে সোলঝেনিৎসিনরা দেখছিলেন রাস্তায় আতশবাজির উল্লাস, আর বুঝেছিলেন এ জয় আমাদের নয়।

১৯৫৩ সালে স্টালিনের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি একটু বদলায়। ইতিহাসের পরিভাষায় এর নাম বরফ গলা (Thaw)। ক্যানসার ওয়ার্ড উপন্যাসে তার দূরাগত ইঙ্গিত অল্পস্বল্প পাওয়া যায়। যদিও ওপর তলার নেতৃত্বের রদবদল হলেও নিচের তলার ব্যবস্থা খুব একটা তখনও পালটায়নি। সৌভাগ্যক্রমে সোলঝেনিৎসিনের লেবার ক্যাম্পের মেয়াদ শেষ হল। হলেও একদা দেশদ্রোহীরা যেহেতু আইনানুসারে কোনক্রমেই পুরো মুক্তি পেতে পারে না, সেইজন্য তাঁকে নির্বাসনদন্ড দেওয়া হল দূর সীমান্ত অঞ্চলের এক গন্ডগ্রামে। ওখানে তিনি নিজের মত খেটে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন। একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে বিনা অনুমতিতে যেতে পারবেন না। দূর থেকে পুলিশ তাঁর গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবে। আর আমৃত্যু এই ব্যবস্থা বহাল থাকবে। সুখের কথাও আছে বৈকি। এতদিনের নিরুপদ্রব দন্ডাজ্ঞা পালনের জন্য তিনি কতকগুলি সার্টিফিকেট পাবেন। এবং সেগুলির জোরে সাধারন নাগরিকের প্রাপ্য পরিষেবাগুলিও পাবেন।

তবু তো একরকম মুক্তি । কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর দরকার ছিল চিকিৎসার। দীর্ঘদিনের অত্যাচারে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। ডাক্তার সন্দেহ করেছে ক্যানসার। এই সন্দেহ ও সার্টিফিকেটের জোরে তিনি নিকটবর্তি শহরের সরকারি হাসপাতালে জায়গা পেয়ে গেলেন। ১৯৫৪ নাগাদ তাঁর অবস্থা এমন হয়েছিল যে সবাই ভেবেছিল তাঁর মৃত্যু আসন্ন। হয়তো তিনি নিজেও। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হল না। হাসপাতালের চিকিৎসা ও বিশ্রামে আস্তে আস্তে তিনি বেঁচে উঠলেন। হয়তো তাঁর ক্যানসার হয় নি। হয়তো অন্য কোনো ব্যাধির সঙ্গে এর রোগলক্ষণগুলি জড়িয়ে গিয়েছিল। সত্যি সত্যিই যদি তাঁর ক্যানসার হত তাহলে পরবর্তীকালে সক্ষম ও সক্রিয় হয়ে অষ্টআশি বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন না। ভাগ্যদেবী তাঁকে দয়া করেছিলেন যে তিনি পাস্টেরনাকের প্রজন্মের (জন্ম ১৮৯০) মানুষ না হয়ে পরের প্রজন্মে জন্মেছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি মুক্তির স্বাদ পেয়ে গিয়েছিলেন যা পাস্টেরনাক কোনোদিন পেলেন না।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর সোলঝেনিৎসিন তাঁর নির্বাসনের গ্রামে আধা–শ্রমিকের জীবন যাপন করছেন সেই সময় রাশিয়ার ইতিহাসে শুরু হল আর একটা নতুন অধ্যায়। পাকাপাকিভাবে ক্ষমতায় এলেন ক্রুশ্চভ এবং শুরু হল De-Stalinization বা স্টালিনের অবমূল্যায়ন। সরকারি কৃপা–অকৃপার ব্যবস্থাটা তখন বইতে লাগল ঠিক উল্টো খাতে। নতুন শাসক যেই জানতে পারলেন স্টালিনের নিন্দা করার জন্য একজন বন্দি হয়ে আছে চিরনির্বাসনে, তক্ষুনি তাকে ছেড়ে দেবার আদেশ এল। ১৯৫৭ সালে সোলঝোনিৎসিন মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতে পারলেন। যেই তিনি লেখবার ও প্রকাশ করবার স্বাধীনতা ফিরে পেলেন তখুনি লিখে ফেললেন (উপকরণ লুকিয়ে সংগ্রহ করা ছিল আগে থেকেই) ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন (১৯৬২) নামক উপন্যাস। স্টালিন জমানার পুলিশি অত্যাচারের ওপর ভিত্তি করে লেখা এই উপন্যাস বর্তমান শাসকদের মন:পূত হল। উপন্যাসটি সরকারি পত্রিকা নভি মীর এ প্রকাশিত হল, এবং প্রশংসিত হল, এক সোলঝেনিৎসিনের কপালে জুটল সরকারি পুরস্কার। এতদিনে স্বদেশে তাঁর সম্পূর্ণ পুর্নবাসন হল।

কিন্তু সত্যিই হোল কি? সোলঝোনিৎসিন তো আর সেই বহুদিন আগেকার সরল যুবকটি নেই। এখন ভারতচন্দ্রের মত তিনিও হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছেন ‘বড়র পীরিতি বালির বাঁধ/ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ’। সতর্কভাবে তিনি বাইরেটা দেখলেন, আর নিরাসক্তভাবে দেখলেন নিজেকে।

এখন তাঁর বয়স মধ্যচল্লিশে। পুরো যৌবনকালটা তাঁর পিষে গেছে অত্যাচারীর স্টীমরোলারের নিচে। এখন তো তাঁর একটি নখদন্তহীন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবার কথা। কিন্তু তিনি অনুভব করলেন ফিনিক্স পাখির মত তাঁর প্রথম যৌবনের ভস্মাবশেষ থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন এক মানুষ। এতদিন ধরে অন্তরে অন্তরে তিনি গোপনে লালন করে এসেছিলেন একটি অগ্নিফুলিঙ্গ, সময়মতো তাকে দাবানলে পর্যবসিত করবার জন্য। যত অত্যাচার বেড়েছে, তত তাঁর জেদ বেড়েছে। দীর্ঘ কারাজীবন ধরে তিনি তিলে তিলে সংগ্রহ করেছেন উপকরণ, নানা তথ্য নানা ঘটনা। কিছু স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন সাংকেতিক উপায়ে। আর বেশিটাই লিখে রেখেছেন লুকিয়ে। চোতা কাগজে লেখা সে সব উপাদান লুকোনো আছে

বোতলের মধ্যে, পোষাকের মধ্যে, আরও কোথায় না কোথায়। এখন সুযোগ পেয়ে ডকুমেন্টারির মত প্রত্যক্ষ জীবন্ত সেইসব উপকরণ তিনি বার করলেন। দুটি জিনিস তাঁর কাছে এখন পরিষ্কার। প্রথমত : তাঁর বয়স হয়েছে। ধীরে সুস্থে একটু একটু করে লিখে প্রতিষ্ঠা পাবার মত সময় ও শক্তি তাঁর নেই। দ্বিতীয়ত : তাঁর আজকের স্বাধীনতা কদিন টিঁকবে বলা শক্ত। তার আগেই তাঁকে নিজের কাজটুকু করে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি এবং সাবধানে। ১৯৬২তে প্রথম বই সগৌরবে প্রকাশ হবার পর আপাতস্বাধীন সোলঝেনিৎসিন আর এক মূহুর্তও নষ্ট করলেন না। একসঙ্গে শুরু করলেন গুলাগ আর্কিপেলাগো এবং ক্যানসার ওয়ার্ড। দিনে চাকরি করেন, রাত্রে লেখেন। লেখার সঙ্গে সঙ্গে তার কপি রাখেন এবং সরিয়ে দেন নিরাপদ দূরত্বে খুব ঘনিষ্ঠ দু একজনের কাছে।

ক্যানসার ওয়ার্ডের ঘটনাবলী যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ঘটেছিল তা ১৯৫৩–৫৪ সালের। বইটা লিখছেন তিনি তার প্রায় আট দশ বছর পরে। ঘটনার সময় তাঁর মন ছিল আচ্ছন্ন, আবিল, বিক্ষুব্ধ, তিনি জানতেন মৃত্যু সন্নিকট। আজ এত বছরের পার থেকে সমস্ত ঘটনাটা তিনি অনেক প্রাজ্ঞ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সমগ্রভাবে দেখতে পারছেন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে দূরত্ব মহৎ রচনার প্রথম শর্ত। সেই দূরত্ব আজ তিনি পেয়ে গেছেন।

সোলঝেনিৎসিনের প্রতিটি আশঙ্কাই অনতিবিলম্বে সত্য হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর লেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল, নভি মির পত্রিকা এবং লেখকসংঘ তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, তিনি কার্যত নজরবন্দি হলেন। কিন্তু এসবে তাঁর কিছুই এসে যায় নি। কারণ ততদিনে তাঁর সব লেখাই রাশিয়ার সীমানা পার হয়ে ইউরোপ ও অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৬৮ তে ক্যানসার ওয়ার্ড, ১৯৭১ এ জানুয়ারী ১৯১৮, এবং ১৯৭১ এ গুলাগ আকিপেলাগো প্রকাশিত হয়ে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছে (১৯৭০ এ তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন (যদিও নিতে যেতে পারেন নি) অবশেষে ষোলকলাপূর্ন করে ১৯৭৪ সালে তিনি রাশিয়া থেকেই সপরিবারে বহিষ্কৃত হলেন। তাতেও তাঁর কিছু যায় আসে নি, কেননা ততদিনে তিনি বুঝে গেছেন সব ঠাঁই মোর ঘর আছে। আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া।

।। ওয়ার্ড নং ১৩ ।।

দক্ষিণ রাশিয়ার কোনও ছোট শহরের সরকারি হাসপাতাল হল ঘটনাস্থল। পুরো হাসপাতাল ঠিক নয়, বরং ক্যানসার উইং এর পুরুষ বিভাগটি যার নাম ওয়ার্ড নং তেরো সেটিই আমাদের লক্ষ্যবস্তু। বোঝা যায় সোলঝেনিৎসিন তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে চান নি। আরও একটা কথা প্রসঙ্গত: বলে রাখি – সোভিয়েততন্ত্রের সমালোচক বলে তাঁর অখ্যাতি থাকলেও বর্তমান হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, সেবাকর্মীদের সম্বন্ধে তাঁর একটা সমীহা এবং মমতাই লক্ষ্য করি। সরকারি হাসপাতালে রোগীর তুলনায় ডাক্তার ও নার্সের স্বল্পতা, জিনিসপত্রের সময়মতো সরবরাহের অভাব, কাজের পর আবার ফাইলপত্র দুরস্ত রাখার বাড়তি দায়, ফাঁকিবাজ ও অদক্ষ সহকর্মীদের ফেলে রাখা কাজের চাপ, এ সমস্ত সামলেও তাঁরা যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন লেখক তা দেখেছেন এবং উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

এইখানে এক বর্ষণমুখর শীতসন্ধ্যায় ওলেগ কস্‌টোগ্লটভ ভর্তি হতে এসেছিল। একা। তার এমন শক্তি ছিল না যে ভর্তি হবার আগেকায় অফিসিয়াল বিশদ ক্রিয়াকর্মের জন্য অপেক্ষা করে। বিভাগীয় রেডিওলজিস্ট ভেরা গ্যাংগার্টের দয়ায় ও উদ্যোগে সে সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকে আধমরা অবস্থায় এই তেরো নং ওয়ার্ডে আনীত হয়েছিল। সেটা গল্প শুরু হবার আগেকার কথা। উপন্যাস যখন থেকে শুরু হচ্ছে ততদিনে সে ঐ অবস্থা থেকে সেরে উঠে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সবাইকে দেখে এবং ওয়ার্ডময় ঘুরে ফিরে বেড়ায়। লম্বা পেটানো চেহারা তার। চোয়ালের কাছে একটা কাটা দাগের জন্য হঠাৎ মনে হয় নিষ্ঠুর, কিন্তু ভালো করে দেখলে সে ধারণা বদলায়। সে যুদ্ধ করেছে। লেবার ক্যাম্পে দাসত্ব করেছে, আপাতত : চিরনির্বাসন পর্বে একজন সার্ভেয়ারের সহকারী মাত্র, কিন্তু কথা বললে বোঝা যায় চরিত্রধর্মে সে সুশিক্ষিত, সচেতন, বুদ্ধিমান এবং স্পষ্টভাষী। বহু বিষয়ে তার নিজস্ব মতামত যেমন আছে, তেমনই আছে তা ব্যক্ত করবার সাহস, কারণ এতদিনে সে বুঝে গেছে তার আর কিছু হারাবার নেই। বোঝাই যায় লেখক তাকে নিজের প্রতিরূপ করেই গড়েছেন, এবং তার চোখ দিয়েই উপন্যাসের যাবতীয় চরিত্রকে দেখিয়েছেন। এই বৃহৎ গ্রন্থে সে অর্থে কোনো গল্প নেই, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি নেই। এখানকার গতানুগতিক জীবনপ্রবাহ থেকে দিনকতকের ভিডিও তুলে এনে যেন আমাদের উপহার দেওয়া হয়েছে এইমাত্র।

ক্যানসার ওয়ার্ডে তিন রকম রোগী আছে। এক যারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে গেছে। তেমন লোক বিশেষ কেউ নেই। দুই – যারা কিছুতেই সারে নি, এবং শেষপর্যন্ত মরে গেছে। তেমন লোকের সংখ্যাও উপন্যাসে কম, কারণ মৃত্যু অবধারিত ও আসন্ন হওয়ামাত্রই কর্তৃপক্ষ তাদের ছুটি দিয়ে দেয় যাতে তারা বাড়িতে গিয়ে মরে। হাসপাতালের রেকর্ড খারাপ না হয়। তিন – এরাই সংখ্যায় বেশি যাদের চিকিৎসা চলছে, কারও প্রথম, কারও দ্বিতীয় কারও বা তারও বেশী বার।

ইয়েফ্লেম পড়ডুয়েভ এই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তার বয়স হবে বছর পঞ্চাশেক। বছর দুই আগেও সে ছিল স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি। এমন কি সাধারণ জ্বরজারি হাম ফ্লু মাথাধরা দাঁতব্যথা তাও তার কোনদিন হয়নি। খাটো, খাও, জীবনকে উপভোগ করো, এই ছিল তার নীতি। তার কোনো বৈধ ছেলেপুলে ছিল না, কারণ বিয়ে নামক ঝামেলায় ঢোকার আগেই সে তার অনুগত স্ত্রীলোকদের তাড়িয়ে দিত, আর তেমন স্ত্রীলোকের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। তার জিভে একদিন একটা স্ফীতি দেখা দিল। প্রথমে সে গ্রাহ্য করে নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন তাকে যেতেই হল ডাক্তারের কাছে। তারপর সেখান থেকে আর একজন, আরও অন্যজন, ভাগ্য যেন তার চুলের মুঠি ধরে এ দরজা ও দরজায় ধাক্কা খাওয়াতে খাওয়াতে শেষ পর্যন্ত এনে তুলল এই তেরো নম্বর ওয়ার্ডে। ডাক্তাররা বলল তোমার জিভে একটা ছোট্ট কাটাকুটি করতে হবে। প্রথমে সে অবশ্যই রাজি হয় নি। তার এতকালের বশংবদ রসনা। একে দিয়ে সে কত কি করিয়েছে। কত সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, কত তোষণ, কত গালিগালাজ, কত ভয় দেখানো, কত চাটুকারিতা, এই জিভই তো তার অস্ত্র ছিল। কিন্তু শেষ অবধি অপারেশন হল এবং আশ্চর্য ব্যাপার সে সেরেও গেল। একটু জড়ানো হলেও কোনও কথায় অসুবিধা রইল না। ডাক্তাররা বলে দিল দুমাস পরে আর একবার অতি অবশ্য আসবে। চিকিৎসা বাকি আছে। বলা বাহুল্য পডডুয়েভ এল না । কিন্তু বছর পার হয়ে গেলে আবার তাকে আসতে হল। নিয়তি যাকে ছুঁয়েছে তার নিস্তার কোথায়? ফিরে এলে পর সংশ্লিষ্ট ডাক্তার তাকে অনেক বকাবকি করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভর্তিও করে নিলেন। হাসপাতালের ডোরা কাটা পাজামা পরে পুরনো পরিচিত তেরো নং ওয়ার্ডে পডুডুয়েভ ফিরে এলো যেন প্রবাসী বন্ধু ঘরে ফিরেছে। ডাক্তারেরা এবার তাকে ঘিরে ধরে ঘাড়ের ওপর ডাইনে বাঁয়ে চপারের মত কোপ দিলেন। কিছুদিন পরে একটু নিচে আরও একটা। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে শেষ অপারেশনটি করবার পর তাঁরা আর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসলেন না। বরং গম্ভীরভাবে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে সাধারনের দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বাক্যবিনিময় করলেন।

ঘাড়ে মাথায় আষ্টেপিষ্টে ব্যান্ডেজ বাঁধা পডডুয়েভ এখন বিশ্বাস করে যে সত্যিই তার ক্যানসার হয়েছে, এবং তার মৃত্যু অদূরবর্তী। তবুও সে কথা অলীক বলে মনে হয়, প্রচন্ড রাগ হয় সকলের ওপর। সারা ওয়ার্ড দাপিয়ে হেঁটে বেড়ায় আর ডেকে ডেকে বলে ভেবো না তোমরা কেউ সেরে যাবে, মরবে সবাই। কেউ কিছু তাকে বলে না, কারণ গল্পটা সবার ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর একরকম।

এই পরিস্থিতিতে একদিন তার হাতে এসে পড়ল একখানা চটি গল্পের বই, হাসপাতালের লাইব্রেরি থেকে কেউ এনেছিল সম্ভবত:। লিও টলস্টয়ের লেখা কতগুলি ছোট ছোট গল্পের সংকলন। পডডুয়েভের বিদ্যাশিক্ষা প্রাইমারির ওপারে নয়, তবু কার্যাভাবে বইটা উলটে পালটে দেখতে গিয়ে বুঝল এ বই শক্ত কিছু নয়। খুব ছোট ছোট গল্প, অত্যন্ত সহজ ভাষায় লেখা, আর গল্পের লোকজনও সব চেনা মানুষ। একটা গল্পের নাম বড় অদ্ভুত –What Man Live By মানুষ কি নিয়ে বাঁচে।

ক্যানসার ওয়ার্ড উপন্যাসে অনেকবার টলস্টয়ের নাম ঘুরে ফিরে এসেছে। হয়ত সোলঝেনিৎসিন টলস্টয়ের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন ভাগ্যকে মেনে নেবার প্রশান্তি। যাই হোক উদ্দিষ্ট গল্পটি বিশ্ববিখ্যাত, সবারই পড়া। তবুও লেখক সেটা ঐ ওয়ার্ডের অধিবাসীদের জ্ঞাতার্থে আর একবার শুনিয়েছেন। আদেশ অমান্য করার জন্য বিধাতা এক দেবদূতকে শাস্তি দিয়েছিলেন। অভিশপ্ত দেবদূত যখন মানুষের রূপ ধরে নগ্ন ও শীতার্ত হয়ে এক সন্ধ্যাবেলায় পথের ধারে পড়েছিল তখন জনৈক মুচি তাকে দেখতে পায়। মুচির নিজেরই দিন চলে না, তবু সে তাকে নিজের গায়ের দুখানা জামার একখানা দিয়ে শীতের থেকে বাঁচায় এবং বাড়ি নিয়ে আসে। মুচির বউ প্রথমে রে রে করে তেড়ে গেলেও শেষপর্যন্ত সে নিজেদের ভাগের সামান্য খাদ্য থেকে তাকে খেতে দেয়। লোকটি বেঁচে উঠে চলে গেল না, হয়ে উঠল মুচির সহকারী একজন দক্ষ কারিগর। মুচির ব্যবসার উন্নতি হল। এখানে থাকাকালীন দু তিনটি ঘটনার বিবরণ আছে। তাতে দেখা গেছে মানবভাগ্যের অনিবার্যতা আবার মায়া দয়াও। পরিশেষে শাপমুক্ত হয়ে দেবদূত যখন স্বর্গে ফিরে গেল তখনই গল্পের নীতিকথাটি ব্যক্ত হয়। মানুষ কি নিয়ে বাঁচে এ প্রশ্নের উত্তর হল Love। শুধু নরনারীপ্রণয় নয়, বৃহত্তর অর্থে Love বা মনের টান। মুচি মুচির বউ দেবদূতকে

বাঁচিয়েছিল দয়াবশে। অন্তর্গত উপকাহিনিতে এক রমনী পথে কুড়িয়ে পাওয়া দুটি অনাথ শিশুকে মায়ের অধিক স্নেহে পালন করেছিল মায়ার বশে, এইরকম আর কি। ভালোবাসার এই সব তত্ব পডডুয়ভের মন:পূত হয় নি। তবু সে একটু থমকেছিল। আর এর থেকেও বিচলিত হয়েছিল অন্যতর একটি উপকাহিনিতে। মুচির ঘরে একদিন এসেছিল এক জমকালো খরিদ্দার। দামি গাড়ি, শালপ্রাংশু মহাভুজ চেহারা যেন লোহা পিটিয়ে তৈরি। যমদূত তাকে দেখে ভয় পাবে। খুব দামি একখন্ড চামড়া বার করে সে বলেছিল কালকের মধ্যেই একজোড়া অত্যুৎকৃষ্ট বুটজুতো চাই। দেবদূত চামড়াটা নিল বটে। কিন্তু জুতো তৈরিতে তার যেন কোনো গা নেই। মুচি তাকে ধমকধামক করলে সে বলে দেখো না কি হয়। শেষ পর্যন্ত পরদিন খবর এল এখান থেকে ফেরার পথে সে লোকটা দস্যুদলের হাতে মারা পড়েছে, শুনে দেবদূত বলল – আমি তো জানতুম, আমি তো তার পিছনে মৃত্যুকে দেখতে পেয়েছিলাম। পডডুয়েভ ভাবে তাহলে জন্মমৃত্যু সব আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। তোমার আমার তাতে হাত নেই। তার চিত্তভার কিছু লঘু হয়। ভাবে এই বাঁধাটা নিয়ে একটু খেলা করা যাক বরং। বিছানায় গুছিয়ে উঠে বসে সমবেত সকলকে ডেকে সে বলে, শোনো ভাইসব, আমার এই ধাঁধাটার উত্তর দাও দেখি – মানুষ কি নিয়ে বাঁচে?

সবার আগে উত্তর দিল আহমদজান। উজবেকিস্তানের আনপড় চাষার ঘরের ছেলে সে। তার মুখে বুলি ফুটেছে সৈন্যদলে এসে। আপাতত সে সেরে উঠছে এবং তার বিশ্বাস সে পুরো ঠিক হয়ে যাবে। সেজন্য সে খুশিমনেই ছিল। সে বলল কি নিয়ে আবার, রেশন নিয়ে, রেশন, ইউনিফর্ম, আর সাপ্লাই, ব্যাস্।

আর কেউ?

মেডিক্যাল অ্যাসিসটান্ট তুরগান সেই সময় ওয়ার্ডে ঢুকছিল। সে এখন রোগীদের ইনজেকশন দেবে। তুরগান ছেলেমানুষ, এখনও ছাত্র, তবু এর মধ্যেই আইন বাঁচিয়ে ফাঁকি দেবার কায়দা কানুনগুলো তার রপ্ত হয়ে গিয়েছে। সে আশাবাদী উৎফুল্ল প্রকৃতির ছেলে। সে বলল আমি বলি – লোকে বাঁচে তার মাসমাইনে নিয়ে।

আর কেউ? দিওমা, তুমি কি বল?

উনিশ বছরের শিষ্ট সভ্য কিশোর দিওমা সকলের প্রিয়। ওয়ার্ডের অন্য লোকেরা জানে না, কিন্তু সে খুব সম্প্রতি জেনেছে যে তার একখানা পা হয়ত কেটে বাদ দিতে হবে। তার চোখে এখন আঁধার নেমে আসছে। ছাত্র যেমন থেমে থেমে মাস্টারমশাই এর প্রশ্নের উত্তর দেয় তেমনি করে সে বলল – কি নিয়ে বাঁচে – প্রথমে বাতাস, তারপর জল, তারপর খাবার, এই নিয়ে বাঁচে।

একটু দূরে দরজার ধারে যথারীতি কুঠিতভাবে বসেছিল শিবগাটভ। তার বয়স বেশি নয়, কিন্তু দেখায় যেন বুড়ো মানুষ। তার অসুখটা বড় খারাপ জায়গায়, সেজন্য সে নিজেই লজ্জিত হয়ে থাকে। সবাই জানে, সেও জানে তার মৃত্যু আসন্ন। শিগ্‌গিরিই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল লোকে যদি তার নিজের জন্মস্থানে থাকতে পেত তাহলে তার কোনো অসুখই করত না। মানুষ বাঁচে তার জন্মস্থান নিয়ে।

কী ভাই, কিসের এত গোলমার, বলতে বলতে এদিকে যে নজর দিল তার মাম পাভেল রুশানভ, সে অভিজাত মানুষ, অন্তত: সে নিজে তাইই মনে করে। সরকারি হাসপাতালের নরককুন্ডে আসবার মত মানুষ সে নয়, কিন্তু ঘটনাচক্রে আসতে হয়েছে। মন্দের ভালো এখানের চিকিৎসায় সে সেরে উঠছে আপাতত :। গলা তুলে সে বলল – মানুষ বাঁচে তার নীতি নিয়ে। মানুষ বাঁচে দেশের সেবা করে। এতে আর দ্বিমতের কী আছে। তা ভাই, এসব কথা উঠছে কেন? গল্পটা সংক্ষেপে তাকে শোনানো হল, মর‍্যালসহ। কে লেখক? কে এনেছে বইটা? হাঁ। লিও টলস্টয় বলে একটা লোক ছিল বটে। লেনিন তাকে হেঁজিপেঁজি (Namby Pamby) প্রতিক্রিয়াশীল বলেছিলেন। দিত্তমার প্রতি (কারণ বইটা সেইই এনেছিল) তার উপদেশ ধাবিত হয় – শোনো হে ছোকরা, বইপত্র বুঝেশুনে পোড়ো। খুব বিনীতভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে বিষন্ন দিত্তমা বলে – আজ্ঞে হাঁ সার, তাইই হবে।

দু মাস পরে এই তেরো নং ওয়ার্ডে যদি কোনো লোক যায় তাহলে সে দেখতে পাবে পুরনো অধিবাসীরা প্রায় কেউই আর নেই। তার বদলে নতুন আর এক দল এসেছে। এবং আগের দলের মত করেই চলছে তাদের জীবনযাত্রা।

।। কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া।।

ক্যানসার ওয়ার্ড উপন্যাসের একটা বড় অংশ ঐ রোগের চিকিৎসাসংক্রান্ত বিশদ বিবরণে ভর্তি। সেটা। গত শতাব্দীর মধ্যভাগের ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ক্যানসার বিষয়ে আগেকার ভীতিও এখন আর নেই। সেকালে ক্যানসার মানেই ছিল অবধারিত মৃত্যু, যেমন তারও আগে ছিল যক্ষা। আজ আর কোনটাই তা নয়। তাই একবিংশ শতাব্দীতে বসে আমি একটি আবেদন জানাতে চাই। এই উপন্যাসকে আমি রোগবিশেষের চিকিৎসা ও তার ফলাফলের কাহিনি হিসাবে একেবারেই দেখতে চাইছি না। আমি এখানে দেখেছি মৃত্যু বা নিয়তির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, যা রূপে রূপান্তরে চিরকাল চলে আসছে। আজও। নিয়তি ছদ্মবেশী। মহাশক্তিধর। দুর্বল মানুষকে নিয়ে সে নাচিয়ে নাচিয়ে খেলা করে। ঈপ্সিত বস্তুটিকে সে শিশুর মুখের সামনে খেলনার মত দুলিয়ে দিয়ে লুকিয়ে ফেলে। ক্যানসার ওয়ার্ড উপন্যাসে সে মারণ রোগের আধারে বর্ণিত হয়েছে। এ এমনই এক অসুখ যা একবার ধরলে কখনো সারবে না। আপাতদৃষ্টিতে সেরেছে মনে হলেও রেখে যাবে কোনও গভীরতর ক্ষতির বীজ। এখানে রোগী ডাক্তার নার্স ও অন্যান্য কর্মী কেউই আর স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। কারণ তারা সবাই এক মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন বধ্যভূমিতে বাস করছে।

নায়কের পুরো নাম ওলেগ ফিলিমিনোভিচ কসটোগ্লটভ। এতবড় খটোমটো নাম পুনঃ পুনঃ না লিখে অতঃপর আমরা তাকে ওলেগ বলেই উল্লেখ করব। ওলেগ বড় তার্কিক । বিশ্বসংসারে এই রীতি প্রচলিত আছে যে ডাক্তারেরা রোগীদের কাছে নিজ কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দেন না। তাঁরা করেন, রোগীরা মেনে নেয়। যদি বা তাঁরা কৃপাবশতঃ কোথাও এক আধটু মুখ খোলেন তা শুধু রোগীর আইনসিদ্ধ অভিভাবকের কাছে। এখানে এই ক্যানসার হাসপাতালে বাঁধা নিয়ম হল রোগী এলে ডাক্তাররা তাদের প্রথমেই বলেন তোমার ক্যানসার হয় নি, অন্য কিছু হয়েছে। ধৈর্য ধরো, সেরে যাবে। তারপর ধাপে ধাপে অগ্রসর হন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অনেককেই ছেড়ে দেওয়া হয় দু মাস বা ছ মাস (যার যেমন দরকার) পরে এসো বলে। ততদিনে রোগলক্ষণ আবার ফিরে এসেছে। তার চিকিৎসা হয়। সে ফিরে যায়, আবার আসে। এইরকম বার বার হয়। শেষে মৃত্যু আসন্ন হলে তাকে একেবারে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটা দু তিন (যার যেমন রোগ) বছর ধরেও চলে। যদি তা না হত তাহলে এরা অনেক আগেই মরে যেত। ডাক্তারেরা জানেন প্রাণ অমূল্য। তাই তাকে যতক্ষণ পারা যায় টিঁকিয়ে রাখতে হবে। যে কোন মূল্যে। কেন করতে হবে? না এটাই তাঁদের পেশাগত অন্ধ বিশ্বাস। এই উপন্যাসে যে সব জাক্তারের চরিত্র আছে তাঁরা সকলেই সৎ নিষ্ঠাবান অক্লান্তকর্মী ও হৃদয়বান মানুষ। কিন্তু পূর্বোক্ত বিশ্বাসে তাঁরা অনড়।

আর ঠিক এইখানেই উদ্যত হয়ে ওঠে ওলেগ এর প্রশ্নাবলী। আমাকে যে ইনজেকশানটা দিতে চলেছেন তার কটা সেশন চলবে? এই ওষুধে কি আছে? তার ফলাফল ঠিক কি কি? আমাকে যে রেডিওথেরাপি করা হচ্ছে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি? রশ্মির প্রভাবে ব্যাধিগ্রস্ত কোষই শুধু নষ্ট হবে, না সুস্থ কোষও নষ্ট হবে? যদি হয় তাহলে তাকে সারাবার কোনো ব্যবস্থা আছে কি? যদি না থাকে তাহলে মানুষকে অঙ্গহীন করে রাখবার নৈতিকতা আছে কি? আমি আমার সমস্ত সুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে দু মাস বাঁচব, না কি অসুস্থ শরীরে ঘষটে ঘষটে দু বছর বাঁচব সেটা আমাকে ঠিক করতে দেওয়া হবে না কেন? আমার নিজের মত করে বাঁচা মরার অধিকার কেন থাকবে না? বলতে বলতে ওলেগ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তার এই চৌত্রিশ বছরের জীবনে নানা দিক থেকে ঘা খেতে খেতে সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তার বিভাগীয় প্রধান লুডমিলা আফসায়েভনা দন্তস্ভার মত বিচক্ষণ প্রবীণ ডাক্তারকেও আক্রমণ করে বলে – নিজেদের আপনারা কী ভাবেন ম্যাডাম, যেই কোনো রোগী আপনাদের খপ্পরে পড়ল অমনি তার নিজের ভাবনাটা আর তাকে ভাবতে দেবেন না? তার হয়ে আপনারা ভেবে দেবেন? আপনাদের পেছনে ''স্থায়ী নির্দেশিকা'' আছে, পাঁচ মিনিটের কন্ফারেন্স আছে। প্ল্যান প্রোগ্রাম আছে, মহামান্য মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ আমরা তো এককণা ধুলো। যেমন আমরা ছিলুম লেবার ক্যাম্পে এখানেই বা তার চেয়ে তফাতটা কি।

ভাবতে আমাদের অবাক লাগে যে একজন রোগী এতসব বড় বড় কথা তার ডাক্তারকে বলেও পার পেয়ে যাচ্ছে। তাও আবার কখন, না ডাক্তার যখন দিনের কর্মশেষে নিজের ঘরে বসে একটু বিশ্রাম করছে তখন। তবু লুডমিলা তাকে তাড়িয়ে দেন না। মুখে যদিও রেগে বলেন এক্ষুনি চলে যাও তুমি, আমি এক্ষুনি তোমার ডিসচার্জ সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছি। কিন্তু সত্যি সত্যিই সেরকম কিছু করেন না। নরমে গরমে ছেলেটাকে ঠিক বশে আনেন। এ যে বেঁচে উঠছে। এই হাসপাতালের বিকারগ্রস্ত হাওয়ার মধ্যে সে একটুকরো তাজা প্রাণ। চারদিকে শুধু নির্বোধ অশিক্ষিত স্বার্থপর চেতনাহীন মানুষের প্লাবন। শুধু একমাত্র এই ভাগ্যহত ছেলেটিই শিক্ষিত, বিচারশীল, সাহসী মার্জিত স্বাধীনবুদ্ধি মানুষ। আহা, সে বেঁচে

থাকুক। এর সঙ্গে সমানে সমানে কথা কওয়া যায়। লুডমিলা একে স্নেহ না করে যাবেন কোথায়? অন্তরের অন্তরে তিনি স্বীকার করেন ছেলেটা বা কিছু বলেছে তা যুক্তিযুক্ত এবং এদের উত্তর তাঁর জানা নেই।

আপাততঃ দুজনের সন্ধি হয়েছে। এই সন্ধিতে শুধু তাদের দুজনের নয়, আরও একজনের কিছু ভূমিকা আছে। তিনি ভেরা গ্যাংগার্ট বা সংক্ষেপে ভেগা? বস্তুত : তাঁর ভূমিকাই অধিক। ওলেগ প্রশ্ন করে প্রতিবাদও করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদের কথা ফেলতে পারে না। দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে সে সেরে উঠছে এবং এরাই তাকে সারিয়ে তুলছে। নানারকম চিকিৎসা হয় তার। সবখানি সে বুঝতে পারে না। তারই একটা পর্বে লুডমিলার সঙ্গে তার নিম্নরূপ কথোপকথন হচ্ছে।

ওলেগ, তোমার অপারেশনটা তো আগেই হয়েছিল দেখেছি। তার কাগজপত্র কই? ম্যাডাম, তখন আমি লেবার ক্যাম্পের বন্দি, আমাদের কোনো কাগজপত্র থাকতো না।

ওলেগ, কেমনভাবে অপারেশন হয়েছিল বলো। ম্যাডাম, কাজ করতে করতে পেটে ব্যথা হত। যেদিন আর না পেরে পড়ে গেলাম সেদিন ক্যাম্পের ডাক্তার আমাকে দেখল। সে বলেছিল এতো এক্ষুনি অপারেশন দরকার। এই বলে আমাকে ওষুধ বিষুধ খাইয়ে তৈরি করল। যেদিন সকালে অপারেশন হবার কথা তার ঠিক আগের সন্ধ্যায় সে গেল বদলি হয়ে।

সে কি জরুরি কেস থাকা সত্বেও।

ম্যাডাম, লেবার ক্যাম্পে ওসব কেউ ভাবে না। যাক্ সে তো গেল, এবার এল একজন লিথুয়ানিয়ান। সে বোধহয় ডাক্তারিটা তেমন জানত না। এখানকার ব্যাপার স্যাপার দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। হল কি সে ভুল করে (আসলে ইচ্ছা করে) একদিন একটা অ্যালুমিনিয়ম টিউব, না কি স্টিলের চামচ কি একটা গিলে ফেলেছিল। ফলে সে ফেরৎ গেল। কয়েকদিন পরে এল একজন জার্মান যুদ্ধবন্দি। আমার অপারেশনটা সেই করেছিল।

বেশীদিন যায় নি, তখন আমি সবে উঠে হেঁটে দাঁড়াচ্ছি সেই সময় দেখি একটা বিরাট ট্রাক এসেছে। ক্যাম্পের অনেকগুলো লোককে একসঙ্গে কোথাও পাঠিয়ে দিচ্ছে। তারা নাকি সব ষড়যন্ত্র করছিল। দেখি আমার ডাক্তারও রয়েছে সেই দলে। শপথ করে বলতে পারি ম্যাডাম সে মোটেই ষড়যন্ত্র করার লোক নয়। অত্যন্ত শান্তশিষ্ট মানুষ। যাই হোক, আমাকে জানলায় দাঁড়াতে দেখে সে হাত নেড়ে নেড়ে জোরে জোরে আমাকে বলল ওলেগ শোনো, এটা খুব জরুরি কথা, তোমার টিউমারের নমুনা আমি শহরের সেন্টারে পাঠিয়েছি। বায়োপসি রিপোর্ট এখানে আসবে, নিয়ে নিও। আরও কি সব বলছিল শুনতে পাইনি। গার্ডরা লাঠি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ওদের গাড়িতে তুলে দিল।

লুডমিলা নিজের জায়গা থেকে নড়েন না। বেশ, তারপর কি হল, তুমি খোঁজ করোনি।

একজনকে দিয়ে খোঁজ করিয়েছিলুম। শহরের সেন্টার বলল যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি। যথাস্থান বলল রাজবন্দিদের মেডিক্যাল রিপোর্ট টপ সিক্রেট। দেওয়া যাবে না। বলতে বলতে দু হাত নেড়ে নেড়ে ওলেগ হো হো করে হাসে। বুঝুন ম্যাডাম, বুঝুন, আমার বায়োপ্সি রিপোর্ট হল টপ সিক্রেট।

একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে। একে মির‍্যাক্‌ল ছাড়া কী বলা যায়। ওলেগ অনুভব করছে সে বেঁচে গেল। যেন ঘুমিয়ে ছিল এতকাল, হঠাৎ জেগে উঠেছে। শরীরের যে সব বোধগুলি তার অনেকদিন ছিল না তারা ফিরে আসছে একে একে। এখন তার খিদে পায়, বাইরে বেরোতে ইচ্ছা করে। এই যে সে এখন বিকেলবেলা হাসপাতালের পাশে এক পার্কে বেড়াতে এসেছে সেখানে সে অনুভব করছে বাতাসে আসন্ন বসন্তের আমেজ। অদূরে একটা ক্লাববাড়ির হাটখোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসছে ব্যান্ডের বাজনা। হাঁটছে সে, এবং প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করছে চলার শক্তি ও চলার আনন্দ। তার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। কিসের বাড়ি তার। তার তো কিছুই নেই। না ঘরবাড়ি না বিষয় সম্পত্তি, না স্ত্রীপুত্রপরিবার, না কর্মক্ষেত্র, না প্রতিষ্ঠা। আছে শুধু তার চিরনির্বাসনের গ্রামে একটা খড়ে ছাওয়া আস্তানা। সেইখানে ফিরে সে নিজের ইচ্ছায় রাস্তা দিয়ে হাঁটবে (রক্ষীর মার্চ অর্ডার শুনে নয়), অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখবে (জেলখানার সার্চলাইটে তারা ঢেকে যাবেনা), ঘর অন্ধকার করে একা শুয়ে থাকবে (কেউ সুইচ অন করে দিয়ে বলবে না আলো নেভানো নিষেধ), নদীতে স্নান করবে, বন্ধুকে চিঠি লিখবে, আরও ইচ্ছা করছে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে (উস্‌টেরেকে কোনও মেয়ের সঙ্গে যদিও তার বন্ধুতা নেই)। পৃথিবীর রূপরসগন্ধস্পর্শে তার পঞ্চেন্দ্রিয় জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসছে রমনীর আসঙ্গলিপ্সাও।

তখনকার দিনের রাশিয়ায় (১৯৫৩–৫৪) স্ত্রী পুরুষের অনুপাত বড়ই অসম ছিল। যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে পুরুষ মরেছে দলে দলে। তারা সব সবল সক্ষম পুরুষ। কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি হয়ে যারা, তারাও বেশিরভাগ পুরুষ। তাই লোকালয়ে ঘরসংসার, দোকানপাট অফিসকাছারি সামলাচ্ছে মেয়েরাই। সর্বত্র স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য। যে হাসপাতালটি উপন্যাসের ঘটনাস্থল সেখানে ডাক্তার নার্স ও অন্যান্য সেবাকর্মীদের মধ্যে পুরুষ মাত্র দুজন, অন্যেরা সবাই মেয়ে। এমন কি রোগীদের মধ্যেও স্ত্রীবিভাগটি অনেক বড়, পুরুষবিভাগ তুলনায় ছোট। সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয় এটা। মেয়েরা বুঝে গেছে সবার কপালে বিয়ে নেই। পুরুষেরা বুঝে গেছে চাইলেই যখন খেলা করবার জন্য মেয়েদের পাওয়া যায় তখন বিয়ের ফাঁদে পড়ে কোন মূর্খ। যুদ্ধের শেষে ঝড়তি পড়তি যে কটি যুবক সুস্থশরীরে অক্ষতদেহে বাড়ি ফিরেছিল তারাও তাদের অপেক্ষমান প্রণয়িনীদের দিকে ফিরে তাকায়নি। যুদ্ধক্ষেত্র তাদের অন্যতর ভোগসুখ শিখিয়েছে। তারা তাই হাত বাড়িয়েছিল পরের প্রজন্মের উচ্ছল চটুল সদ্যযুবতীদের দিকে।

ক্যানসার ওয়ার্ডের ডাক্তার নার্সদের মধ্যে একমাত্র প্রবীণা লুডামিলারই স্বামী পুত্র সংসার আছে। অন্যেরা সবাই একা। নার্স জোয়ার বয়স অল্প, দেখতে ভালো। নিজের কাজের জায়গায় সে একটি দক্ষ, পরিশ্রমী হাসিখুশি মেয়ে, কিন্তু কাজ সেরে সে যখন বাড়ি ফেরে সেখানে তার জন্য কোনো আলো জ্বালা থাকে না। নার্সের পোষাক ফেলে দিয়ে সুদর্শনা, সুসজ্জিতা, স্ফুরিতাধরা জোয়া পার্টিতে যায়। বাহুলগ্ন হয়ে নাচবার জন্যে অনেক পুরুষবন্ধু তার আছে। সে নাচে। আর নাচতে নাচতেও সতর্ক থাকে যেন কোন প্রতারকের পাল্লায় না পড়ে। ওলেগের চোখে সেই প্রথম দেখতে পেয়েছিল বাসনার স্ফূরণ, কিন্তু যৎসামান্য ফ্লার্টের বেশি তাদের যোগাযোগ এগোয়নি। দুজনেই বুঝে গেছে তাদের মধ্যে কোনো মনের টান নেই, তারা ভিন্ন জগতের লোক।

ওলেগ এখন নিশ্চিত সেরে উঠেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে তার স্বাধীন নির্বাসনে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু এখানকার ডাক্তাররা তাকে ছাড়ছে না। তারা জানে চিকিৎসা বন্ধ করে ওলেগকে এখন ছেড়ে দিলে দু মাস পরেই তার রোগটির পুনরাবির্ভাব ঘটবে। তাকে পুরোপুরি সারাবার একটা পথ তারা খুঁজে পেয়েছে, এবং সম্ভাবনা যখন আছে তারা সেটা প্রয়োগ করবেই। একটা মানুষকে যদি বাঁচানো যায় তারা বাঁচাবেই। কেন তাদের এত চেষ্টা? সে কি পেশাগত জেদ, মায়ামমতা, নাকি অন্য কিছু? মানবচরিত্র বড় দুর্জ্ঞেয়। ওলেগ এদের চেষ্টাটা বোঝে। সেজন্য সে অবশ্যই কৃতজ্ঞ। তবু তার উদ্‌ভ্রান্ত মন অনুভব করে কী একটা জালে সে জড়িয়ে যাচ্ছে। সে জালের নাম কি ভেরা গ্যাংগার্ট, বা ভেগা, যার অনুরোধ সে ফেলতে পারে না। মানবচরিত্র তার নিজের কাছেও দুর্জ্ঞেয়।

মনে মনে ওলেগ ভাবে তার নির্বাসিত জীবনের প্রথম রাত্রিটির কথা। সেই ওডিসির কাল থেকে মানুষ জানে নির্বাসন মানে শুধু দন্ড নয়, মুক্তিও বটে। যে রাত্রিতে রক্ষীরা প্রথম তাকে নিয়ে গ্রামের প্রান্তে পৌঁছল সে রাত্রে আশ্রয় জুটেছিল সন্নিহিত পুলিশফাঁড়িতে। রাত গভীর। তাকে শুতে দেওয়া হয়েছে বাইরের ছাউনিতে। শুয়ে শুয়ে সে দেখছে অন্ধকার আকাশপ্রান্তর। আহা, কতকাল সে অন্ধকার দেখেনি। অন্ধকারও দেখা যায়। অদূরে আস্তাবল থেকে ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ আর মস্ মস্ করে ধাস চিবোনোর শব্দ আসছে। তৃপ্তিতে ভরে যাচ্ছে তার দেহমন। পরদিন সকালে তাকে ছেড়ে দিয়ে রক্ষীরা চলে গেল।

কাজাকস্থান সন্নিহিত মরুসদৃশ গন্ডগ্রাম। গ্রামের নাম উস্‌টেরেক। স্থানীয় ভাষায় এ শব্দের অর্থ হল তিনটি পপলার। সত্যিই এখানে একটা উঁচু টিলার ওপর পরস্পর মুখোমুখি তিনটি অতি প্রাচীন পপলার যেন এ ওকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সোজা সটান গাছ নয়, কোমরের কাছে একটু বাঁকা। এদেশে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ খালি হাতে, প্রায় সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য অবস্থায়। এখানেই তাকে খুঁজে নিতে হবে আশ্রয়, খাদ্য ও জীবিকা। শেষ পর্যন্ত কিছুই আটকালো না। এদেশে এমন পরিত্যক্ত নির্বাসিত লোক দূরে দূরে আরও আছে। স্থানীয়রা ব্যাপারটা জানে। ধারে আশ্রয় ও খাদ্য মিলল। জীবন সুরু করল সে ইঁটভাটার শ্রমিক হিসাবে। লেখাপড়া জানা লোক বলে এখন সে পদোন্নতি হয়ে একজন সার্ভেয়ারের অ্যাসিস্টান্ট। পুরনো দিনের সঙ্গীসাথীদের পুরনো ঠিকানার আর পাওয়া গেল না। তারা হয় মৃত, নয় নিরুদ্দিষ্ট, নয়ত অধরা। এদেশ জনবিরল , বিশেষ করে পুরুষবিরল। কিছু গ্রাম্য স্ত্রীলোক আছে, আর আছে প্রচুর বাচ্চাকাচ্চা। কুমারী মেয়েরা পুরুষ দেখলে প্রথমেই হিসাব করতে বসে বিবাহযোগ্য কিনা। মেলামেশার কথা পরে। এদেশের কোনও মেয়ের দিকে ওলেগ তাকায় নি। কেবলমাত্র একটি পরিবারের সঙ্গে তার কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তারাও চিরনির্বাসিত। সত্তর বছরের বৃদ্ধ দম্পত্তি তারা ছিল শিক্ষিত ও শহরবাসী। মধ্য বয়সে সম্পূর্ণ বিনাদোষে পাকেচক্রে পড়ে তারা কারারুদ্ধ হয়েছিল। তারপর দীর্ঘকাল ধরে

পৃথকভাবে এ জেল ও জেল ঘুরে ঘুরে অবশেষে শেষ জীবনে তারা নির্বাসনে এক হতে পারল। এত সুখ তারা রাখবে কোথায়? এমন প্রসন্নচিত্ত মানুষ ওলেগ আর দেখেনি। তাদের একটা নিজস্ব কুঁড়েঘর আছে, আর আছে দুটি বৃহদাকার কুকুর। যাদের তারা পুত্রস্নেহে পালন করে। ওলেগকেও এরা নিজেদের নিত্যসঙ্গী বলেই ভাবে।

ক্যানসার ওয়ার্ড উপন্যাস দুখন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে আছে উপস্থাপনা ও বিস্তার। দ্বিতীয় খন্ডে লেখক জাল গুটিয়ে নিয়ে উদ্দিষ্ট চরিত্রগুলির পরিণতি দেখিয়েছেন। সঙ্গে আছে নানা প্রাসঙ্গিক তর্কবিতর্ক, যা রাশিয়ান কথাসহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যাই হোক উপন্যাস যত এগোয় আমরা উপলব্ধি করি নিয়তির মুঠি উত্তরোত্তর শক্ত হচ্ছে। গ্রন্থসূচনায় তেরো নং ওয়ার্ডের যে সব রোগীদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল তাদের প্রাণশক্তি নিঃশোষিতপ্রায়। প্রলম্বিত চিকিৎসায় তারা দগ্ধে দগ্ধে মরেছে। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগিয়েছেন সন্দেহ নেই।

ওলেগই একমাত্র মানুষ যে বেঁচে উঠছে। কিন্তু সে কেমন বাঁচা। একমাস আগে যেদিন সে প্রথম উপলব্ধি করেছিল পৃথিবীর রূপরসগন্ধস্পর্শে তার ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ হয়ে উঠেছে সেদিন সে ছিল আনন্দিত। কিন্তু তার ডাক্তাররা জানত এ নিরাময় সাময়িক। তাকে এখন ছেড়ে দিলে শীঘ্রই তার শরীরের অন্যত্র রোগলক্ষণ প্রকাশ পাবে। তারা তাকে সেইজন্য ছেড়ে দেয় নি। একটা সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে তারা নিজেদের যাবতীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রচেষ্টা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। তার অন্যরকম একটা চিকিৎসা চলছে যে বিষয়ে সে পুরোপুরি জানে না।

পুরোপুরি জানে না, কিন্তু একেবারে জানে না তা নয়। দ্বিতীয় খন্ডের সূচনায় ওলেগ তার উস্‌টেরেক বাসী বৃদ্ধ বন্ধুকে একখানা চিঠি লিখেছে। তবে মূল বক্তব্য এই যে – দীর্ঘ আয়ুর জন্য সে লালায়িত নয়। তার জীবন অভিশপ্ত। যৌবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়, পুরো চোদ্দটা বছর তার কেটেছে জেলখানায়, লেবার ক্যাম্পে, নির্বাসনে। তারও পরে আক্রান্ত হয়েছে এই মারণরোগে। আয়ু তার কাছে বিড়ম্বনা। সে শুধু ফিরতে চায় তার উস্‌টেরেকের নির্জনবাসে। সেখানে মুক্ত আকাশের নীচে নিজের ছোট্ট ছোট্ট ভালোলাগাগুলি নিয়ে কাটাতে চায়। কিন্তু এখানকার কর্তৃপক্ষ তাকে না ছাড়লে, তার বৈধ কাগজপত্রগুলি না পেলে সে ফিরবে কি করে। তখন তো পুলিশ আবার তাকে ধরে কোনো লেবার ক্যাম্পে ঠেলে দেবে। তাই সে বাধ্য হয়ে হাসপাতালে আছে। যে চিকিৎসা চলছে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সে সম্পূর্ণ জানে না। সে ভালো নেই। আপাতত: তার পঞ্চেন্দ্রিয় নিস্তেজ, মন, উদ্বিগ্ন, জীবন বিস্বাদ এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

কথাগুলি সত্য, কিন্তু পুরোপুরি সত্য নয়। ওলেগের মত তীক্ষ্নবুদ্ধি সজাগ মানুষ ঠিকই আন্দাজ করেছে বর্তমান চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। বলতে কি তার জেরার মুখে ভেগা প্রকারান্তরে তা স্বীকারও করেছে। তবু সে যেতে পারছে না, কারণ এই প্রথম তার জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে একটি আশ্চর্য নারী, তার অভিশপ্ত জীবনে ভাগ্যের দেওয়া শেষ উপহার, ভেগা। এই হাসপাতালে প্রবেশ করার প্রথম দিনেই সে তাকে উদ্ধার করেছিল আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে। তার পর ক্রমে ক্রমে এই নারীর ব্যবহারে, দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে, শরীরী ভঙ্গিতে, তাকে প্রাণে বাঁচাবার মরিয়া প্রচেষ্টায় সে অনুভব করেছে অপার করুণা, আকুলতা, শুভ কামনা, হয়ত বা ছদ্মবেশী প্রেম। তার চৌত্রিশ বছরের শূন্য জীবনে যা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা এই শেষবেলায় যদি শরীরী হয়ে দেখা দিলই, তবে সে তাকে অমান্য করবে কোন শক্তিতে, কোন যুক্তিতে?

ভেরা গ্যাংগার্ট বা সংক্ষেপে ভেগা রাশিয়ার নাগরিক হলেও জাতিতে জার্মান। সুন্দর, মেধাবী দক্ষ, নিষ্ঠাবান, সহৃদয় এক নারী। এই হাসপাতালের সে সম্পদ। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে সে বড় দুঃখী। সেকালের আরও অনেক মেয়ের মত তারও সব কিছু নষ্ট হয়েছে যুদ্ধে – বাবা ভাই, মা এবং প্রেমিক, অল্পবয়স থেকেই একটি ছেলের সঙ্গে তার ভাব ছিল। পরস্পরকে তারা খুব ভালোবাসত। এখন ভেগার মনে অনুশোচনা হয় কেন তারা যুদ্ধ আসন্নকালে বিয়ে করে নেয় নি। তাহলে কিছুকাল তো তারা থাকতে পারত একসঙ্গে। ছেলেটি, তখনও সে প্রায় কিশোর যুদ্ধে চলে গেল। এবং অল্পদিন পরেই মরে গেল। তার সেই নবযৌবনের নিষ্পাপ মুখ এখনও ভেরার ঘরে ছবি হয়ে ঝুলছে। কিন্তু মহাকাল নির্দয়। আজ সে ছবি ভেরার কাছে দূরের নক্ষত্রের মত। তাকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো উত্তাপ সেখান থেকে আর আসে ন। ভেরা তাই শীতার্ত। এমন সময় কোথা থেকে এল এই রুক্ষ যুবক। মৃত্যু যাকে স্পর্শ করেছে সে তো আর ভালোবাসার যোগ্য থাকে না। তবু ভেরার মন কেন আকুল হয় তার জন্য। কেন আশ্রয় নিতে ইচ্ছা করে তার ধীশক্তিসম্পন্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিচে। সে তাই সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে বাঁচাতে (অবশ্যই লুডমিলার সহায়তায়) ক্যানসার থেকে যে তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়েছে। কিন্তু তার দামও কম দিতে হয় নি। এর জন্য নষ্ট হয়ে যাবে তার যৌন ক্ষমতা।

ভ্রমরগুঞ্জনের মত মৃদু শব্দ তুলে একটি যন্ত্র চলছে। ওলেগের শরীরে রক্ত দেওয়া হচ্ছে। ঘরে তারা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। খুব শান্তভাবে ধীরে ওলেগ বলে চলে – ভাগ্য তো আমার সব কিছু আগেই কেড়ে নিয়েছিল। একটি মাত্র যে ক্ষমতা আমার বাকি ছিল, অন্য প্রাণের মধ্যে নিজেকে স্থায়ী করার ক্ষমতা। সেটাও তোমরা কেড়ে নিলে। চিরকালের জন্য আমাকে বিকলাঙ্গ করে রেখে দিলে। নিকৃষ্টতম বিকলাঙ্গ। একটু ইতস্তত:, একটু নাড়াচাড়া, তারপর হাহাকারের মত ছুটে এল ভেগার গলা। বলতে বলতে স্বর ভেঙ্গে গেল তার। "There must be some people, who think differently. May be only a handbul but differently all the some. If everyone thought your way, who could we live with? What would we live for? Would we be able is live at all?"

(কেউ কেউ নিশ্চয়ই অন্যরকম করে ভাবে। হতে পারে তারা সংখ্যায় খুব কম, কিন্তু ভাবে ঠিকই। তুমি যেভাবে দেখছ সবাই যদি তেমন করেই দেখত তাহলে আমরা কাকে নিয়ে বাঁচতুম, কি নিয়ে বাঁচতুম, আমরা আদৌ বাঁচতে পারতুম কি?)

।। অন্ধকারের উৎস হতে।।

ধর্মবক যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিল বার্তা কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিল – মহাকালের বৃহৎ কটাহে দিন ও রাত্রির হাতা দিয়ে নেড়ে চেড়ে বিধাতা প্রাণীসমূহকে রন্ধন করছেন এইই বার্তা। কেউ যদি সেইরকম জিজ্ঞাসা করে ক্যানসার ওয়ার্ড উপন্যাসের বার্তা (Moral) কি, তাহলে সেখানেও এই উত্তর অনায়াসে দেওয়া যায়। তবু যেহেতু মহৎ উপন্যাসমাত্রই ''মানবজীবনের জটিল সমস্যাসমূহের ব্যাখ্যামাত্র'' তাই এখানেও প্রতিমার পিছনে চালচিত্রের মত নানারকম ভাবনাচিন্তার একটি পরিমন্ডল আছে। –

এই উপন্যাসে মূল গল্প অতি সংক্ষিপ্ত বা বলা ভালো সেরকম কোনও গল্পই নেই। কিন্তু তেরো নং ওয়ার্ডের চার দেওয়ালের বাইরে রাশিয়া নামক যে একটি বৃহৎ দেশ আছে তার অস্তিত্ব আমরা সব সময়েই টের পাই। সেখানে যে একটা ওলোটপালোট চলছে, সে দেশও যে ভালো নেই, তা বুঝতেও আমাদের অসুবিধা হয় না। সত্যি বলতে কি লেখক সচেতনভাবেই তা আমাদের বুঝতে দিয়েছেন। এ বই তিনি লিখেছিলেন একটা ঘোরের মধ্যে। তাঁর হাতে বেশি সময় ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে সব কথা বলে যেতে হবে এমন একটা তাগিদ তাঁর ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল। সেইজন্য খুঁটিয়ে পড়লে এই উপন্যাসে গঠনগত শিথিলতা এবং অল্পবিস্তর পুনরুক্তি আবিষ্কার করা যায়। সোলঝেনিৎসিনের অন্যান্য রচনাও তাই। কিন্তু সেই দোষ খুব বড় হয়ে দেখা দেয় না অন্য একটি কারণে, – তা হল এর অন্তর্নিহিত এক প্রবল প্রাণশক্তি ও গতিবেগ। যেমন খরস্রোতা নদী তার গতিপথে ছোট বড় প্রস্তরখন্ডকে অনায়াসে টেনে নিয়ে চলে সেইরকম লেখকের মনে ভিতর থেকে উঠে আসা লাভাস্রোত পাঠককে টেনে নিয়ে চলে। কোথাও দাঁড়াতে দেয় না। তা যদি না হত তাহলে ক্যানসার ওয়ার্ডের মত এইরকম একটি বৃহৎ বিষন্ন ও শ্বাসরোধী গ্রন্থ আমরা সহজে পড়ে উঠতে পারতাম না।

দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গটি সোলঝেনিৎসিনের নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত হয়ে আছে তার নাম রাজনীতি। এককালে এই রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই পাস্টেরনাক ও সোলঝেনিৎসিন বিষয়ে অনেক অসাহিত্যিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। এ বই আমি প্রথম পড়েছিলুম অনেক কাল আগে। তখনকার যে সংস্করণ আমার হাতে এসেছিল তার মলাটে ছিল একপ্রান্তে মরচে ধরা একটি পাতাজোড়া কাস্তে হাতুড়ির ছবি। ঐ সংস্করণ কারা করেছিলেন, এবং কেনই বা মলাটে ঐরূপ চিত্র ছিল জানি না। সেদিন বইটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল রাজনীতি এখানে গৌণ বিষয় মাত্র। একবিংশ শতাব্দীতে বসে সোভিয়েটতন্ত্রের উত্থান পতনের যাবতীয় ঘটনার পরে আবার বইটি পড়ে একই কথা মনে হচ্ছে। বইটির অভিঘাত হৃদয়ে, বুদ্ধিতে নয়। রাজনীতি এখানে অবশ্যই আছে, মাটির মধ্যে জলের মত মিশে আছে, কিন্তু তা এসেছে মূল বক্তব্যের সমান্তরাল প্রতি–তুলনার মত, গৌণভাবে। রাজনীতি এখানে ব্যঞ্জনাধর্মী।

ক্যানসারের রোগীকে যেমন একদিকে সারাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে রোগলক্ষণ ফুটে ওঠে, কিছুতেই নির্মূল করে সারানো যায় না, কেননা তার শরীরের মধ্যে ঢুকে গেছে এক দুশ্চিকিৎস্য মারণবীজ, ঠিক তেমনই বর্তমান(সোলঝেনিৎসিনের কালের) সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে গেছে কোনও মহাশক্তিধর অশুভ নীতি যার প্রভাবে রাশিয়ার মতো একটা বিশাল, প্রাচীন, সুসভ্য, সংস্কৃতিবান, মহাদেশোপম দেশের আত্মা তিলে তিলে মরে যাচ্ছে।

বাইরে সে বেশ আছে। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, সমরসজ্জা, কলকারখানা, খেলাধূলা, বিশ্বব্যাপী ঝাঁ চকচকে প্রচার, তবু তার আত্মায় ঘুণ ধরেছে। কেন এত দমন, কেন সে লৌহযবনিকার অন্তরালে থাকে, জ্ঞানীগুনী লোকেরা কেন দলে দলে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন, দলে দলে কবি সাহিত্যিকেরা আত্মহত্যা করলেন, কেন? শতবর্ষ কেটে গেল, সোলঝেনিৎসিনের পরে আর কোনও বড় লেখক উঠে এলেন না, কেন? এ সব প্রসঙ্গে কোনরকম রাখঢাক না করেই সোলঝেনিৎসিন নিজ মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। এবং সেইজন্যই সারা পৃথিবীতে সোভিয়েটতন্ত্রের উপাসকেরা তাঁকে ভাবতেন মহাশত্রু। আজও ভাবেন।

রুশ বিপ্লব শুরু হয়েছিল সমাজতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে। তার গুরু গুরু ধ্বনি শোনা গিয়েছিল অনেক আগেই। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন বিপ্লবীদের অনেকগুলো গোষ্ঠী ছিল। গৃহযুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে। অবশেষে একটি গোষ্ঠী জয়ী হয়, এবং দৃঢ়মুষ্টি নিরঙ্কুশ শাসনব্যবস্থা চালু করে। বাইরের জগতের সঙ্গে সর্বসাধারণের যোগাযোগ তারা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। ধ্বংসের পরে দেশগঠনের জন্যে এইরূপ কঠোরতা দরকার ছিল এই তাদের ব্যাখ্যা।

এ সব কথাই পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়। যেটা পাওয়া যায় না তা হল বিপ্লবের সময়ে এবং বিপ্লবের পরে সত্যি সত্যি দেশের ভিতরকার অবস্থা কেমন ছিল। একদম আমজনতা যারা, রাজনীতি অর্থনীতি বোঝে না, শুধু বাঁচে, কিংবা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বৃত্তিজীবী অরাজনৈতিক মানুষ, যারা বিচার করে, তারা কেমন ছিল, সে সব কথা ইতিহাসের বইয়ে থাকে না, থাকে গল্প উপন্যাসে। বরিস পাস্টেরনাকের ডক্টর জিভাগো ঐ সময়পর্বের প্রথমাংশের জীবন্ত দলিল। যেখানে আমরা দেখি বড় বড় শহরের বাইরে বিরাট রাশিয়া জুড়ে আভ্যন্তরীন শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস অদৃশ্য হয়েছে। যেটুকু আছে তার জন্য চলছে কাড়াকাড়ি। সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা ছিল না। অনাহার, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, ডাকাতি, হত্যা ও প্রতিহত্যা ছিল নিত্যসহচর। শেষ পর্যন্ত স্টালিনপন্থী বলশেভিকরা যুদ্ধে জিতে সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন। নিজের বাড়িতে ফিরে জিভাগো দেখলেন ইতিমধ্যে সেখানে পুরনো সমাজবিন্যাসের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গছে। এমন নয় যে ধনী ও দরিদ্রের সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এমনও নয় যে ধনী ও দরিদ্র স্থান বিনিময় করেছে। যেটা হয়েছে তা হল একটা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী তৈরি হয়েছে (দলভিত্তিক) তাদের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র দুইই আছে। প্রতিদিনের জীবনযাত্রা রেশননির্ভর, এবং রেশনদোকানে সামগ্রী অপ্রতুল। কিন্তু বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোকেদের কোন জিনিসের অভাব হয় না। ক্ষমতা তাদের অসীম। তাদের অভিপ্রায়ই আইন। জিভাগো দেখলো তার নিজের বাড়ি চলে গেছে হাউস কমিটির হাতে। সেখানে যে জাঁকিয়ে বসে রাজত্ব করছে সে একদা তাদের ভৃত্যশ্রেণীতে গণ্য হোত। জিভাগোকে তারা দয়া করে একটা কুঠুরিতে একতলার অন্ধকার কোটরে থাকতে দিয়েছিল, বিস্তর মুখনাড়া সমেত। জিভাগো আরও দেখল যে একসময় যারা ছিল সমাজের মাথা – বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, সচ্ছল, রুচিশীল, মার্কসীয় পরিভাষায় যাদের নাম বুর্জোয়া, সেই শ্রেণীটি উধাও হয়ে গেছে। তার জায়গায় জাঁকিয়ে বসেছে, মার্কসীয় পরিভাষায় যারা ছিল পাতিবুর্জোয়া তারাই। এরা মধ্যমেধার পূজারী, চতুর, সুকৌশলী, আত্মস্বার্থসাধনে তৎপর এবং বিবেকবর্জিত।

জিভাগো শুরুটা দেখেছিলেন। এক প্রজন্ম পরের সোলঝেনিৎসিন (বা কস্‌টোগ্লটভ) দেখছে এ অবস্থার কোনও বদল তো হয়ই নি, বরং ব্যবস্থাটা আরও জাঁকিয়ে বসেছে। সুবিধাভোগী ঐ বিশেষ শ্রেণীটিই আজ দেশ চালায়। এদের নিজেদের মধ্যে অদৃশ্য বোঝাপড়া আছে। এরা জানে কে বিশ্বাসভাজন আর কে নয়। প্রতি কর্মকেন্দ্রের শীর্ষে আছে নিজেদের লোক যে শ্রেণীস্বার্থরক্ষায় সতত যত্নবান। পাড়া কমিটি পাড়ার প্রতিটি লোকের ফাইল রক্ষা করে। সেই ফাইল ধরে সর্বসমক্ষে তাদের মূল্যায়ন হয়। সেটা খুব স্বচ্ছ ব্যাপার। লোক ডেকে লোক জানিয়ে, দেশপ্রেমের উদাও বক্তৃতা দিয়ে এসব হয়। কিন্তু অন্তরালে থাকে অন্য খেলা। কাউকে তুলতে বা ফেলতে, বাঁচাতে বা মারতে, নিজের বা পরের স্বার্থে গূঢ় কক্ষে বসে দুতিন জন, মন্ত্রণা হয় নিচুস্বরে, ফাইল যায় বদলে। এরাই সত্যিকারের ক্ষমতা ধরে। এরা উচ্চ বেতন, যাবতীয় সুযোগ সুবিধা, নিকটাত্মীয়ের চাকরি বাকরি, এবং কার্যান্তে স্পেশাল পেনসন পায়। ক্যানসার ওয়ার্ড উপন্যাসে পাভেল রূশানভ এই শ্রেনীর চরিত্র। লেখক তাকে আদ্যন্ত রেখেছেন, এবং তার ও তার স্ত্রীপুত্রকন্যার আচরণের দ্বারা এই শ্রেণীটিকে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

খুব কি অচেনা মনে হচ্ছে ছবিটা? পাঠকের কি মনে হচ্ছে না এসব দেখবার জন্যে রাশিয়ায় যাবার দরকার কি? আমার নিজের ঘর কী দোষ করল? ঠিকই, শাসক সর্বত্রই একরকম। কিন্তু গণতন্ত্রে ব্যবস্থাটা তত আঁটসাঁট হয় না। ফাঁকফোকর থেকেই যায়। লোকে জানতে পারে কিছু কিছু। বিরোধীপক্ষ থাকে, ভোট থাকে, ক্ষমতাকেন্দ্রের বদল হয়।

থাকে প্রচুর সাধারণ মানুষ, এবং তাদের পিছনে কিছু অ–সাধারণ মানুষ যারা শিখিয়ে চলে Eternal vigilance is the price of liberty.

রাশিয়ায় তাহলে প্রতিবাদ হল না কেন? এত বড় একটা দেশের সব লোকই কি বোকা, ভীরু, কাপুরুষ। নিশ্চয়ই নয়। উপন্যাসের শেষের দিকে সুলুবিন নামের একটি মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। বুড়ো মানুষ, কাকতাড়ুয়ার মত চেহারা, মৃত্যু তার আসন্ন। সে ওলেগকে বলেছিল – কে বলল প্রতিবাদ হচ্ছে না, হচ্ছে তো। খুব গোপনে, খুব চুপিচুপি হচ্ছে, এখনও তারা অজ্ঞাতবাসে আছে, ঠিক বেরিয়ে আসবে সময় মত। মাঝখানে হয়ত গলে যাবে দু তিনটে ব্যর্থ প্রজন্ম। কেন গলে যাবে তার উত্তরত্ত সুলুবিন দিয়েছে। – আলেক্সি ফিলিপিনোভিচ (পুরো নামে সম্বোধন) কাল বাদে পরশু আমার অপারেশন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যেন বেঁচে না ফিরি, কারণ আমার অসুখটা খুব খারাপ ধরণের। হায়, জীবিতেরা সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করে কীর্তি নিয়ে, আমরা রোগীরা প্রতিযোগিতা করি কার অসুখ কত বেশি তাই নিয়ে। ইয়ংম্যান, তোমার সব কথা আমি জানি। তোমার লেখাপড়া নষ্ট হল, তুমি বন্দি হলে, তারপর লেবার ক্যাম্পে দাসত্ব করলে, চিরকালের জন্য নির্বাসিত হলে, তারও পরে তোমারই হল ক্যানসারের মত মারণব্যাধি। তুমি নিশ্চয়ই ভাবো তোমার মত হতভাগ্য কেউ নেই। শোনো বলি, তুমি ভাগ্যবান, কেননা তোমাকে আমার মতো এত নিচু হতে হয় নি। তোমাদের ওরা ধরে এনেছে, বিচারের প্রহসন শেষে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়েছে, তোমরা মাথা উঁচু রেখে মরেছ। আর আমাদের, এই বুদ্ধিজীবীদের, যারা লেখাপড়ার চর্চা করে বাঁচতুম, তাদের কী করেছে জানো? ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে বিচার সভায়। হাততালি দিয়ে দিয়ে, মুঠি ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আমাদের বলতে হয়েছে দেশদ্রোহীদের দন্ডে আমরা কত খুশি। খবরের কাগজে খবর বেরিয়েছে সারা দেশ একমন একপ্রাণ হয়ে রায় দিয়েছে। হা: একমন একপ্রাণ! আমাদের অধিকার নেই একা মানুষ হবার। সব সময়ই 'আমরা'। একবার কি হল শোন, ইন্ডাস্টিয়াল পার্টির কয়েকটা লোককে ধরে এনেছে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দেবে বলে (সত্য ঘটনা, ১৯৩০ সালের, দেশের কিছু অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদ ছিলেন সে দলে)। আমাদের মধ্যে একজনের আর সহ্য হয় নি। এক পেশার লোক আমরা। সে শুধু বলেছিল আমাকে দয়া করুন, আমি কোন পক্ষেই ভোট দিতে চাই না, বুঝে দেখো বিরোধিতা করেনি, শুধু দন্ডদানের পক্ষে ভোট না দিতে চেয়েছিল। দিল না। পর্ব মিটল। তারপর পার্টির নেতারা সবাই তাকে ঘিরে ধরল – ব্যাখ্যা করো, তোমার অবস্থান ব্যাখ্যা করো। সে বলেছিল বিপ্লবের পর বারো বছর কেটে গেছে। এখন আমাদের দমননীতিতে পরিবর্তন দরকার। চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, দালাল এইসব। পরদিন পুলিশ এসে তাকে নিয়ে গেল। আর খোঁজ পাই নি।

সুলুবিন ছিল পন্ডিত লোক। মানববিদ্যার নানা শাখায় কৃতী, চিন্তাশীল লেখক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অরাজনৈতিক লোক। কর্মক্ষেত্র থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে (বলা হল বদলি) তাকে পাঠানো হল প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান করে।

এইরকম করে সুপরিকল্পিতভাবে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। লেখক সংঘের অনুমতি ছাড়া কারও একটা অক্ষরও ছাপা হবে না। লেখা তো দূরের কথা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করাও অপরাধ এদেশে। সুলুবিনের এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নেই, কারণ স্বয়ং বরিস পাস্টেরনাকের জীবনই তো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যিনি হতে পারতেন বড় লেখক তাঁকে রেখে দেওয়া হয়েছিল দপ্তরের গুরুত্বহীন অনুবাদক করে। লোকসমাজে যারা জনসাধারণ নামে পরিচিত তারা সুখে দুঃখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে, একসঙ্গে বেঁচে থাকে, তারা চালনা করে না, চালিত হয়। অতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা তাদের নেই। সে ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরা সংখ্যায় অল্প, নিভৃতচারী, হয়ত বা পরস্পরের অচেনা। কিন্তু তাঁরা আছেন বলেই মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে। সাহিত্য, শিল্প বিজ্ঞান, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, মতাদর্শ তর্কবিতর্ক, অন্দোলন, আত্মবলিদান সবই উঠে আসে সমাজের ঐ ক্ষুদ্র অংশ থেকে। তাঁরা দেশের জাগ্রত বিবেক। একনায়কতন্ত্র এঁদের ভয় পায়। রাশিয়ায় তাদের ধ্বংস করা হয়েছে। কাল নিরবধি, পৃথিবী বিপুল, আত্মাত্ত অমর। প্রতিকার হতে তাই সময় লাগবে।

রাশিয়ান উপন্যাসের একটা সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে। সে ধারায় সোলঝেনিৎসিনের স্থান কোথায় এবং কিভাবে থাকবে সে সংক্রান্ত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয়। ক্যানসার ওয়ার্ড উপন্যাসের একটি নিবিড় পাঠই আমার লক্ষ্য

ছিল। সেই পাঠের মধ্যে দিয়েই দেখতে পেয়েছি লেখকের গভীরসঞ্চারী অন্তর এবং তাঁর দেশকাল। লেখক কোনো সমস্যারই সমাধান দিতে চান নি। তিনি শুধু নিজের মনটি পরতে পরতে খুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। পরবর্তী ভাবনার দায় তার নিজের।

এমন কি ওলেগ বা ভেরার জীবনকেত্ত তিনি ছেড়ে দিয়েছেন অনিশ্চিতের দিকে। উপন্যাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে, যখন ওলেগের ছুটি আসন্ন, তখন উস্টেরেফের বৃদ্ধ বন্ধু তাকে চিঠিতে জানান সেখানেও পরিস্থিতি ভালো নেই। সরকারি কিছু নিরাপত্তাকর্মী এসেছিল। গ্রামে তারা তান্ডব চালিয়ে গেছে। ওলেগের জন্য কি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে সে জানে না। তবুও তো সেখানেই ওলেগকে ফিরতে হবে। আমাদের মনে পড়ে একদিন ক্যানসার হাসপাতাল থেকে অনির্নীতব্যাধি বলে ছাড়া পাওয়া সোলঝেনিৎসিনও তাঁর নির্বাসনের আস্তানায় ফিরেছিলেন। ভবিষ্যৎ সেদিন তাঁর কাছে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকার। আজ ওলেগ কস্টোগ্লটভ তেমনি ফিরে চলেছে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। "The Other hadn't survived, but he had, he hadn't even died of cancer". কিন্তু কি করবে সে তার আয়ু নিয়ে। মালপত্র রাখবার কামরায় বাঙ্কের ওপর সে কোনক্রমে শোবার জায়গা করে নিয়েছে। সামনে আটচল্লিশ ঘন্টার যাত্রা। ভেরার সঙ্গে সে দেখা করে নি। দু:খে অনুশোচনায় কষ্টে তার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। কোটের হাতায় মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে সে বাঙ্কে শুয়ে পড়ে। তারপর রাত গভীর হয়। নিদ্রিত মানুষের বোঝা নিয়ে ট্রেন দুলে দুলে চলে। ঘুমন্ত ওলেগের লম্বা পা বাঙ্ক থেকে বেরিয়ে প্যাসেজের ওপর দুলতে থাকে। এইখানেই লেখক উপন্যাস শেষ করেন।